সীমান্তের নিরাপত্তার নীতি ও চর্চায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি কোথায়? ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তপ্রদেশ থেকে কিছু মন্তব্য

সাহানা ঘোষ

২২ জুলাই, ২০২৪

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ও ভারতের দিকের প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর ঠিক মাঝখানে নিরাশ বর্মনের জমিটি অবস্থিত। এই অংশের জন্য বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর চালু করা নানা নিষেধাজ্ঞার কারণে, তিনি তাঁর নিজের জমিটিই চাষ করতে পারছেন না আর সংসারের খরচ চালানর জন্য তাঁর বাড়ির ঠিক পাশেই তিনি গাঁজা চাষ করতে শুরু করেছেন। কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ করে যাওয়ার পর, হঠাৎ-ই বিএসএফ-এর নজর তাঁর উপর পড়ে। পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দেয় এবং সমস্ত ফসল পুড়িয়ে দেয় আর এর পর থেকে তাঁর প্রতিবেশিদের উপরেও পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজর রাখা শুরু হয়। একই সীমান্তের ধারে, অন্য একটি গ্রামে একটি ভূমিহীন পরিবারে বড় হওয়া হাসান আলীর হাতে বিকল্প জীবিকার সুযোগ খুবই কম। তাঁর দুই জীবিকার মধ্যে একটি হল উত্তর ভারতের নির্মাণশিল্পে শ্রমিকের কাজ ও অন্যটি সীমান্তবর্তী গ্রামে চোরাচালানের কাজ এবং এই দুই বৃত্তিরই নিজস্ব বিপদ ও ক্লেশ আছে। বাংলাভাষী মুসলিম মাত্রেই "অনুপ্রবেশকারী" বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে ও তাঁরা সারা দেশেই ক্রমশ আরও বেশি বৈরভাবের শিকার হচ্ছেন। এই কারণে আলী তাঁর গ্রামেই ফিরে আসেন এবং গবাদি পশু কেনাবেচার মত কঠিন ব্যবসাটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই দুই উদাহরণ থেকেই হয়ত বোঝা যাচ্ছে যে সীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চলগুলিকে যেরকম বিশেষভাবে ও - জাতীয় নিরাপত্তার পরিভাষায় - সংকীর্ণভাবে শাসন করা হয়, তার বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ব-সীমান্ত ধরে বসবাসকার পরিবারগুলি একটি অর্থবহ জীবন যাপনের জন্য প্রতিদিন কি পরিমাণে লড়াই করে চলে। আমার সদ্যপ্রকাশিত *এ থাউজ্যান্ড টাইনি কাটসঃ মোবিলিটি অ্যান্ড সিকিওরিটি অ্যাক্রস দ্য বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া বর্ডারল্যান্ড* (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস ২০২৩/ইওডা প্রেস ২০২৪) নামের বইতে আমি ভারত ও বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পথে যেভাবে সীমান্তের আশেপাশে বহু প্রজন্ম ধরে যাঁরা জীবন কাটিয়েছেন, তাঁদের প্রাত্যহিক বাস্তবতাকে নিরীক্ষা করে, সামরিকীকৃত সীমান্তের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যয়কে চিহ্নিত করেছি।

"উত্তম" সীমান্ত নিরাপত্তা নীতি ও চর্চা ঠিক কি দিয়ে নির্মিত? ভারত-চিন সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে "ব্যাপক উন্নয়ন" আনার উদ্দেশ্যে ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রামটি যখন ঘোষিত হয়, তখন এই প্রশ্নটি আবার আলোচনার কেন্দ্রে আসে, এবং তার পর থেকেই সেটি বারংবার আলোচিত হচ্ছে। এই প্রকল্পটি, আশ্চর্যজনকভাবে, ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সরকারের প্রতিক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি। নেহরু সরকারের অধীনের প্রকল্পটি যে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে সহায়তা দিয়েছিল, প্রায় সেই একই গ্রাম বর্তমান প্রকল্পের আওতায় আসছে। এই প্রতিক্রিয়াটিই বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, যা আগে ভারত সরকারের সেভেন্থ প্ল্যান (১৯৮৫-৯০)-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সেভেন্থ প্ল্যান অনুযায়ী "জটিল পরিকাঠামো"-র জন্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলি অতিরিক্ত অর্থসাহায্য পেত। তবে, যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি এই রকম প্রতিক্রিয়াশীল এবং দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন দ্বারা চালিত হয়, জনকল্যাণ ও জনগণের সমস্যা নিয়ে, সেই প্রকল্পগুলির ধারণা সীমিত ও পিতৃতান্ত্রিক হয়ে থাকে, এবং সীমান্তের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা ও আশা-আকাঙ্খার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই ঘটনাটি সবচেয়ে স্পষ্ট হয় ভারত ও বাংলাদেশের মাঝখানের "বন্ধুত্বপূর্ণ" সীমান্তের প্রেক্ষিতে। নানা ভৌগলিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টপূর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তটি, দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক (অনুপ্রবেশ, চোরাচালান) ও

নিরাপত্তারব্যবস্থার পরিকাঠামো (সীমান্তে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী, ফ্লাডলাইট, মানব-প্রাচীর হিসেবে বিএসএফর উপস্থিতি) প্রেক্ষিতে সংসদের আলোচনায় ও কমিশনের প্রতিবেদনে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ সরকারী নীতিই দাবি করে যে, সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দিয়ে ভারতের পূর্বাংশের এই সীমান্তপ্রদেশকে এমনভাবে ভরিয়ে দিতে হবে, যাতে প্রতি সাড়ে তিন কিলোমিটার অন্তর একটি করে সীমান্তরক্ষার ঘাঁটি প্রস্তুত থাকে। বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স, যাকে ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-পাকিস্তানের মাঝের সীমান্ত বরাবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তা সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। উত্তম প্রতিরক্ষা বেষ্টনী, ওয়াচ টাওয়ার আরও ফ্লাডলাইট, রাত্রিকালীন সেন্সর এবং নতুন রাস্তার মত বিএসএফ-এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নতীকরণের অর্থ কিন্ত সামগ্রিকভাবে বলিষ্ঠ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অর্থবহ উন্নয়ন নয়। আমি দেখেছি যে, যেহেতু নীতিগুলি স্থানীয় বাসিন্দাদের ভালোমন্দ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং ধরেই নেয় যে তাঁরা অপরাধী। এছাড়াও, তাঁদের জীবন, জমি এবং আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিমূর্ত নানা নির্দেশের অনুবর্তী হিসেবে দেখা হয় বলে এই ধরনের সীমান্ত নিরাপত্তাব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সরাসরি বিরোধ তৈরি হয়।

এর তীব্রতম ও ক্ষতিকর প্রভাব যে তিনটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তা হল, কৃষি-অর্থনীতি, সীমান্তের দুই প্রান্তে রয়ে যাওয়া আত্মীয়তা এবং নাগরিক-সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক।

কৃষিনির্ভর একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনের উপর সীমান্ত-নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব ঠিক কতটা, তা সবচেয়ে স্পষ্ট হয় জমির মূল্যহ্রাসের মধ্যে দিয়ে। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে সীমান্তের প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ক্রমাগত নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হচ্ছে, এবং এর ফলে অনেক কৃষিযোগ্য জমির ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও নিম্ন আসাম অঞ্চলে এই ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও পান নি। তার উপর, একটি সামরিকীকৃত সীমান্তের সবচেয়ে কম দৃশ্যমান, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাবের মধ্যে একটি হল, জমির মূল্যহ্রাস ও কৃষির দুর্দশা আরও বেড়ে চলা। সীমান্ত ও ভারতের দিকের প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর মধ্যে যে শত শত একর জমিতে ঠিক কোন শস্যের ফলন হবে, জমিতে প্রবেশ ও সেচের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য সময়, অতি কঠোরভাবে পণ্য ও পরিচয়পত্রের পরীক্ষার মত অসংখ্য নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞার ফলে, এখানে কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও, এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া এই কৃষিপ্রধান সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও রাজবংশী কৃষকদের নিরুৎসাহও করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী তফসিলি জাতিগুলির মধ্যে সংখ্যায় সর্ববৃহৎ হল রাজবংশী জাতি এবং বাঙালি মুসলিমরা এই রাজ্যের জনসংখ্যার ৩০%। আমার দীর্ঘ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা যে অঞ্চল ঘিরে, উত্তরবঙ্গের সেই সীমান্তবর্তী কুচবিহার জেলার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী হল এই দুই গোষ্ঠী। তার উপরে, সামরিকীকৃত সীমান্ত নিরাপত্তার নীতি এই অঞ্চলগুলির একদা-সমৃদ্ধ গ্রামীণ বাজারকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। নবনির্মিত রাস্তাগুলি সীমান্তের গা ঘেঁষে যে বিএসএফের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি আছে, সেগুলিকে সংযুক্ত রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়। এই ব্যবস্থার ফলে অধিকাংশ সময়ই বহু প্রজন্ম ধরে ব্যবহৃত পায়ে চলা গ্রামের পথ, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ছিল, সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। বাসিন্দাদের জন্য, সাধারণত, এই নতুন রাস্তাগুলির উপর অধিকার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। সন্ধ্যার পর এইগুলি ব্যবহারের অনুমতি তাঁদের নেই এবং অন্ধকার নেমে আসার পর, সরকারীভাবে চাপিয়ে দেওয়া ও স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া কারফিউ-এর কারণে, এই অঞ্চলে ভয় ও সন্দেহের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তা গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনকে গভীরবাবে প্রভাবিত করছে।

সীমান্তের অভ্যন্তরের অঞ্চলের প্রাত্যহিক চলাফেরার উপর বিএসএফ-এর নজরদারি শুরু হওয়ার কারণে, সীমান্তের সামরিকীকরণ এখানকার সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার প্রায় প্রতিটি বাসিন্দারই সীমানার অপর পারে কোনও না কোনও আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। আমার বইতে যেমন দেখিয়েছি যে, এমনকি এই রকম যখন অবস্থা তখন, অবিশ্বাস্য হলেও, দেশভাগের পরেও সীমান্তের একপ্রান্তে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যের সঙ্গে পরপ্রান্তের বাসিন্দার বিয়ের মত ঘটনা আজও অব্যাহত। এর কারণ কিন্তু অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতা, কিম্বা

সীমান্তের উপস্থিতি বা প্রয়োজনীয়তাকে অবজ্ঞাও নয়, বরং এই ঘটনার জন্ম যুদ্ধ, বাস্তু থেকে উৎখাত হওয়া এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে। মাঝে সীমান্তের বাধা সত্ত্বেও গড়ে ওঠা বা বহমান আত্মীয়তার বন্ধন, এই রকম অস্থির রাজনৈতিক অবস্থায় সামাজিক ও বস্তুগত সমর্থন ও সহায়তার উৎস হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে, সীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চলে সীমান্তের এপারওপারে চলাচলকে তাই লাইফওয়ার্ল্ড (যে সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কাজকর্ম এবং যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তির জীবন গড়ে ওঠে)-এর উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী পুনর্নির্মাণের অংশ বলে ধরা হয়। এর ফলে, অধিকাংশ সময়ই, সীমান্তের দুই প্রান্তের মহিলারাই বিপজ্জনকভাবে ও গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াত করে নতুন শিশুর জন্ম, বিবাহ অনুষ্ঠান উপস্থিত থেকে বা উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে সীমান্তের অপর পারের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন। এই সংযোগের একটি পুরনো পরিকাঠামো ছিল ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্ট, একটি বিশেষ নথি যার মাধ্যমে এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত সম্ভব ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সময়, বন্ধুত্বের দমকা হাওয়ায়, এই পাসপোর্ট চালু হয় এবং ২০১৩ সালে তা বন্ধও হয়ে যায়। জেলাস্তরের সদরদপ্তর থেকে এই পাসপোর্ট পাওয়া যেত, যার ফলে "বৈধভাবে" সীমান্তের একপার থেকে অন্যপারে ভ্রমণের আমলাতান্ত্রিক আবশ্যিক শর্তের পালন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অনেক বেশি নাগালের মধ্যে ছিল ও খরচপত্রও অনেক কম ছিল। সরকারিভাবে "বন্ধুত্বপূর্ণ" এই সীমান্তকে ঘিরে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি কঠোর হয়ে ওঠার পর, সাধারণ আত্মীয়তার সম্পর্কগুলির ওপরেই সবচেয়ে ভারি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। জাতীয় পরিচয়ের বিপরীতে পরিবারকে দাঁড় করান হয় এবং কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারবেন তাঁরা, তা বেছে নিতে নাগরিকদের বাধ্য করা হয়।

অবশেষে, বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বিএসএফ-এর সম্পর্ক ভাঙ্গনপ্রবণ। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রাত্যহিক চর্চায়, বাংলার সীমান্তবাসীরা, যাঁরা মূলত বাঙালি মুসলিম ও নিম্নবর্গ, তাঁরা প্রত্যেকেই গুপ্ত অভিবাসী বা চোরাচালানকারী এবং সীমান্তের অপর প্রান্তে বসবাসকারী তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা সবাই অপরাধী। দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত নীতি ও চর্চা সর্বদাই পরিকাঠামো ও বদ্ধ সীমান্তের সামরিকীকৃত ধারণাকে, আর্থসামাজিক কল্যাণ ও সীমান্তের দুই প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা দীর্ঘ-বহমান সাংস্কৃতিক জীবনের থেকে অনেক বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে। এরই ফলশ্রুতি স্থানীয় অধিবাসী ও বিএসএফ-এর মধ্যে তৈরি হওয়া বিরুদ্ধতামূলক সম্পর্ক। যেমন, চোরাচালান বন্ধ করার জন্য, বিএসএফ, ভারতীয় সীমান্তের গ্রামগুলিতে অসংখ্য নজরদারীর বন্দোবস্ত করেছে ও নিয়ম তৈরি করছে। বিএসএফ-এর টহলদারী চলে যে যে এলাকাতে, যা সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বেও হতে পারে, সেখানকার বাসিন্দারা রোজই মাঠ থেকে বাজারে, বিদ্যালয় থেকে বাড়ি, এমনকি দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের পথেও জেরার মুখোমুখি হন বা তাঁদের শরীরের কোথাও কোনও জিনিস লুকনো আছে কিনা গায়ে হাত দিয়ে তারও তল্লাসী হয়। কৃষিজাত শস্য সীমান্তবর্তী শস্যক্ষেত্র থেকে বিক্রির জন্য বাজারেই যাক বা বাইরের বাজার থেকে সীমান্তের গ্রামগুলিতে সাইকেল, ওষুধপত্র, বা বাড়ি তৈরি মালমশলার মত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানই হোক – এ সব কিছুর আনা-নেওয়ার অনুমতি পেতে একটি অতি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই অনুমতি পাওয়ার জন্য, সীমান্তের বিএসএফ ঘাঁটিগুলিতে স্থানীয় বাসিন্দারা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। এই ব্যবস্থা একটি এমন সংঘাতমুখী ক্ষমতাকে উপস্থাপিত করে, যে ক্ষমতার অলিন্দে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ, নাগরিক কর্তৃত্বকে হারিয়ে দেয় এবং কঠোর হাতে স্থানীয়দের অধিকার সংকুচিত করে ও তাঁরা নিজভূমিতে "দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক" হিসেবে প্রতিপন্ন হন। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন যে সংগঠনগুলি, তাঁরা, বিএসএফ-এর সীমান্তে টহলদারীর সময় তাঁদের হাতে যে খুন হয়, তার হিসেব দেয়। কিন্তু, আমার বইতে আমি যা বলার চেষ্টা করেছি তা হল যে, যে হিংস্রতা দৃষ্টিকে কম আকর্ষণ করে সেগুলিই আসলে এই কৃষি-নির্ভর সীমান্তের সামরিকীকরণের বুনটকে গড়ে তোলে। এই পরিকাঠামোগত বৈরিতার কারণে, বাংলার সীমান্ত "বন্ধুত্বপূর্ণ" হওয়া সত্ত্বেও, বিএসএফ-এর জওয়ানদের জন্যও এখানে কাজ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। বিএসএফ-এর সমস্ত স্তরের কর্মীরাই এই সীমান্তকে, তাঁদের অভিজ্ঞতায়, সবচেয়ে উত্তেজিত ও বিপজ্জনক চাকরীর জায়গা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির বা পড়াশুনোর জন্য দরকারি জিনিসপত্র বিতরণের মত জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে বিএসএফ যে নাগরিকদের জন্য কল্যাণকর নানা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে, সেগুলিকে, এই বৈরভাব ও পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখলে, নিতান্তই কপট ও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

যে সীমান্তের নিরাপত্তামূলক পরিকাঠামো সীমান্তপ্রদেশের বাসিন্দাদের কল্যাণ ও হিতকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থের বিপরীতে দাঁড় করায়, যেই পরিকাঠামো স্বল্পস্থায়ী ও কোনভাবেই ফলপ্রসূ নয়। সীমান্ত অঞ্চলকে একটি জনশূন্য পরিসর, যার শুধুমাত্র প্রয়োজন নিরাপত্তার সদা-প্রসারিত পরিকাঠামো, যা আবার এমন অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি আসলে প্রতিবন্ধক – এই হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং সীমান্ত অঞ্চলকে দেখা দরকার এমন একটি ঐতিহাসিক আর্থসামাজিকভাবে জড়িত পরিসর, যার মূল্য তার নিজেরই শর্তে বিচার্য। উন্নয়নের টপ-ডাউন (উচ্চতম স্তর থেকে শুরু করে ক্রমশ নিম্নতম স্তরে যাওয়া) কল্পনায় সীমান্তবাসীদের গুরুত্ব আছে একমাত্র জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে এবং সেই কল্পনায় তাঁদেরকে কেবলমাত্র কল্যাণমূলক সাহায্য ও জাতীয়তাবাদী জ্ঞানের নিষ্ক্রিয় ও অভাবগ্রস্ত গ্রহীতা হিসেবে দেখা হয়। এই ধরনের কল্পনা কোনওভাবেই সত্য ও সফল হতে পারে না। যখন সীমান্ত সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি ও চর্চা সক্রিয়ভাবে সীমান্তের বাসিন্দাদেরই অবমূল্যায়ন করে ও অসংখ্য প্রজন্ম ধরে তাঁরা যে দেশে, জীবিকায়, গৃহে ও আত্মীয়তায় বেঁচে থেকেছেন, তার মধ্যেই তাঁদের অপরাধী হিসেবে দাঁড় করায়, তখন কল্যাণ ও দেশপ্রেমের অনুভূতি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। এই সব কিছুর উপরে, যদি সীমান্তের দুই প্রান্তের সাধারণ নাগরিকদের পারস্পরিক আর্থসামাজিক সম্পর্ককে ক্রমাগত অপরাধ হিসেবে দেখা হয় এবং তাকে খর্ব করার চেষ্টা চলতে থাকে, তাহলে কি সীমান্ত কখনই বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে?

সাহানা ঘোষ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরের অ্যানথ্রপলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর *এ থাউজ্যান্ড টাইনি কাটসঃ মোবিলিটি অ্যান্ড সিকিওরিটি অ্যাক্রস দি বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া বর্ডারল্যান্ডস* (ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস ২০২৩, ইয়োডা প্রেস ২০২৪), নামের বইতে তিনি উত্তরবঙ্গের একটি সংযুক্ত অঞ্চল থেকে একটি জাতীয় সীমান্তপ্রদেশের নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সীমান্তের সামরিকীকরণ কিভাবে সামাজিক সম্পর্ক, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, লিঙ্গপরিচয়ের উপর ভিত্তি করে চলাফেরার অধিকার এবং নাগরিকত্বকে প্রভাবিত করে, সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাপনের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে, তার আলোচনাও তিনি এই বইটি করেছেন।